সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও সাম্যবাদী কবি। বামপন্থী আন্দোলনকে সাহিত্যিক রূপ দেবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। তিনি প্রথম থেকেই অত্যন্ত চড়া সুরে সাম্য ও সংহতির কথা শুরু করেছেন। কোন দূরত্ব-অস্পষ্টতা বা ব্যঞ্জনার ভরসা না রেখে অথচ স্পষ্টভাবে তিনি বলতে শুরু করেছেন :

কৃষক, মজুর। তোমরা শরণ—
জানি আজ নেই অন্য গতি
যে পথে আসবে লাল প্রত্যুষ
সেই পথে আসবে লাল প্রত্যুষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে।”

পংক্তিগুলি পার্টির ইস্তাহারে ব্যবহৃত হতে পারত। সমগ্র মানব-সমাজের মুক্তিই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লক্ষ্য, যে লক্ষ্য ছিল সমর সেনেরও। বাক্‌ভঙ্গিতে অকুণ্ঠিত ঋজুতা এবং অনমা দৃঢ়তা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য, প্রেম এবং প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে উড়িয়ে দেওয়া তাঁর রীতি :

আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাতছানি
ও সব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া—
আমরা তো নই প্রজাপতি-সন্ধানী,
অন্তত আজ মাড়াই না তার ছায়া। [সকলের গান]

সুকান্ত ভট্টাচার্য

এই মানসিকতা নিয়েই সুকান্ত ভট্টাচার্যের কিশোর-মন বলে উঠেছিল—

কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়,
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

সাম্যবাদী চেতনা নিয়ে সুকান্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতোই কাব্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু এই কবিকে পরিণতির পথে অগ্রসর হতে দেয়নি। অনেক সম্ভাবনা নিয়েই সুকান্ত ভট্টাচার্যকে চলে যেতে হয়েছে। জীবন ও শিল্পকে তিনি মেলাতে চেয়েছিলেন। শ্রেণীসংগ্রামে আস্থা ও শোষণ-নীতির প্রতি ঘৃণাই তাঁর কবিতায় সোচ্চার। দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধের নিদারুণ অপচয় ও মহৎ বিনষ্টি এই কবির বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল, তার মূল আপাত অদৃশ্য গভীর। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা একটি কিশোর-মনকে এভাবে নাড়া দিতে পারত না, যদি না পারিপার্শ্বিক ভাঙনের ছাপ তার দুটি তরুণ-চোখে ধরা পড়তো। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় এ মনোভাব স্পষ্ট :

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।...
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

সাম্যবাদী কবিরা এবং কাস্তে নিয়ে কবিতা

আধুনিক কবিতার পালাবদলের দিন যে পুনরাগত সেই ছবি দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নতুনত্বের প্রয়াস নয়, ব্যক্তি-চেতনার মুক্তিও নয় বর্তমান কবিদের কাছে ক্রমশই বড়ো হয়ে উঠেছে সাম্যবাদ, বরং কিছুটা আকস্মিকভাবে। সময়ের দিক থেকে সাম্যবাদী কবিরা এসেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে। দুটি বিধ্বংসী মহাযুদ্ধ এবং তার প্রত্যক্ষ স্পর্শের নিষ্ঠুর করাল-দংষ্ট্রা যখন জাঁতাকলের মতো ভারতবাসীকে মথিত করেছিল তখন আর পশ্চিমী-সভ্যতার ওপর বিশ্বাস রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। অপরদিকে রাশিয়া ও চীনে সাম্যবাদের সাফল্য এবং শোষিতের জয় নতুন করে আশার সঞ্চার করলো আধুনিক কবিমানসে। রাজনীতির সঙ্গে রাজনৈতিক-সংস্থা আন্দোলন-পন্থার সঙ্গে ওতোপ্রোত সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে যখন অপরিচয়ের দূরত্ব কমিয়ে আনলো তখন আর সাম্যবাদের ওপর কবিতা লেখায় বাধা রইল না। এ সময়ে বাংলাদেশে তথা ভারতের রাজনীতি নিয়ে অন্যান্য দলগুলিও নিশ্চয় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল কিন্তু কবিতায় তাদের কোন ছায়া পড়েনি।

'কাস্তে' নিয়ে কবিতা লেখা একসময় প্রবণতায় পরিণত হয়েছিল। অবশ্য এ পথের প্রথম পথিক সম্ভবত সুধীন্দ্র দত্ত। তিনি ১৯৩৯-এ লিখলেন :

আকাশে উঠেছে কাস্তের মত চাঁদ
এ যুগের চাঁদ কাস্তে। [কাস্তে]

বিষ্ণু দে ১৯৪১-এ :

হৃদয়ে হাতুড়ি ঠোকে প্রেম, ওঠে চাঁদ
এ যুগের চাঁদ বাঁকা কাস্তে। [এমার্সন-দের]

সুকান্ত ভট্টাচার্য :

আজ শুধু কাস্তে দাও আমার এ হাতে।
আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্য প্রখর—
যে কাস্তে শত্রুর কাছে দেখা দেবে অত্যন্ত ধারালো। [ফসলের গান]

দীনেশ দাশ :

চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে। [কাস্তে]

অধিক উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন, বোঝা যায় 'কাস্তে' ক্রমশ একটি দলীয় প্রতীক থেকে পরিবর্তিত হচ্ছে অন্যান্য অর্থবহ-প্রতীকে। চাঁদ রূপান্তরিত হচ্ছে 'কাস্তে'তে। চিন্তাধারার সাম্য-স্থাপনেও সাম্যবাদের এই ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

কবিরা : চল্লিশের দশক

কবিতার ইতিহাসে বিশ শতকের তিরিশের দশক যতখানি নতুনত্ব নিয়ে এসেছিল, চল্লিশের দশক ততখানি প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসেনি। সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে রেখেও এই সিদ্ধান্তে আসা যায় রবীন্দ্র-পরবর্তী পাঁচজন আধুনিক কবির মতো বৈচিত্র্য ও সৃষ্টি-প্রতিভা এই দশকের কোন কবির মধ্যে ছিল না, অবশ্য এই সময়ের কবিরা এখনও কবিতা লিখছেন। তবু জীবনানন্দ বুদ্ধদেব সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে এবং অমিয়

চক্রবর্তী যাঁরা চল্লিশের কবিদের কাছে প্রেরণাস্থল ছিলেন, সত্তরের দশকেও তাঁরাই রয়ে গেলেন প্রেরণার উৎস; পঞ্চাশের দশকের কাছে চল্লিশের কোন কবি আদর্শ হতে পারলেন না। প্রকৃতির লীলায় চূড়ান্তভাবে ফসল ফলে যাবার পরে মাঠ কিছুদিন শস্যারিক্ত হয়ে পড়ে থাকে, সেটাই বিধির অলঙ্ঘ্য বিধান। সাহিত্যের জগতেও এই প্রকৃতি-লীলার অমোঘ-নিয়ম কার্যকর হয়। উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের চূড়ান্ত সফলতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পরেও দেখা গিয়েছে এমনি অনুল্লেখ্য মেঘলা দিনের ছবি। রবীন্দ্রানুসারী-কবিসমাজ পাশাপাশি কয়েকটি নাম ইতিহাসের পাতায় ছোট ছোট অক্ষরে লিখে দিয়েই হারিয়ে গেলেন কালের অন্ধকারে। রবীন্দ্রপ্রভার মধ্যেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এলেন আধুনিক পাঁচজন কবি, নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান কবি তাঁরা, তাঁদের আবির্ভাবের পরে, আবার সেই অনুর্বর দিনগুলির পালা শুরু হলো। কিছুদিন, চল্লিশের কবিরা সেই অনুর্বর দিনগুলির কবি; ঐ সময়ে নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যবারাকে বজায় রাখাই বড়ো কথা, সুখের বিষয়, চল্লিশের কবিরা সদ্যোজাত আধুনিকতাকে নিজেদের কবিতায় সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন। পূর্ববর্তী কবিদের স্ফূর্তি বা বিত্ত এঁদের যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না রবীন্দ্রনাথের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। বাধা না থাকলে বাধা অতিক্রমের শক্তিও থাকে না, চল্লিশের কবিরা প্রথম থেকেই সেই দুরতিক্রম্য শক্তি ও ব্যবধান থেকে বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথ আর তাঁদের সমস্যা ছিলেন না, উপরন্তু অনুসরণের জন্য তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আরো পাঁচজনকে পেয়েছিলেন। আত্ম-প্রতিষ্ঠার দুর্বার আবেগ ও দুর্মর বাসনা না থাকায় এঁদের আপাতিক স্বতোস্ফূর্তি ঘটেছিল, রাজনীতিক তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে। সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় বড়ো কবি হলেও রাজনীতির চেতনাই বড়ো হয়ে উঠেছে। এই চেতনার আগ্রাসী প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত না করতে পারলে কবি বৈচিত্র্যলোকের অধিকারী হতে পারেন না, সমর সেন সেজন্যই কবিতার পথ ত্যাগ করেছেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বড়ো কর্মী হতে চেয়েছেন। সৌভাগ্যবশত তিনি কবিই হয়েছেন। আর সুকান্ত ভট্টাচার্য তো হারিয়ে গেছেন অকালে, অকালমৃত্যু না হলে তিনি হয়তো এ যুগকে নতুন কিছু দিতে পারতেন।

চল্লিশের কবিরা

চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, রাম বসু, নরেশ গুহ, অরুণ সরকার, অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মনীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী ব্যক্তিগত স্বর-সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। আদর্শ নিয়ে এঁদের ভাবতে হয়নি। সামান্য কারণে ভাবিত হয়ে এঁরা মুক্তি অনুসন্ধান করলেও রাজনীতিক ভাবনা এঁদের মনে প্রধান ভাবনা হয়ে ওঠেনি, অনেকে জীবনকে সরলীকৃত করেছেন সমস্যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিংবা আঙ্গিকের প্রকরণে নিবিষ্ট হয়ে। পরবর্তীকালে নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায় ও সুশীল রায় একটি কাব্যধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার জন্য ষাট এবং সত্তরের তরুণ কবিরা তাঁদের অনুবর্তীরূপে কাব্যানুশীলণ করেছেন।

অরুণ মিত্র

চিত্রকল্পনির্ভর কবিতা রচনায় অরুণ মিত্রের কৃতিত্ব বেশি, তিনি 'লিপিকা'র মতো গদ্যভঙ্গিতে কাব্য রচনা করেছেন, তার সঙ্গে অবশ্য মিশেছে এ যুগের সচেতন মনোবৃত্তি—

"বাসনাগুলো এক সময়ে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠবে। তার ঢেউ দেয়াল ছাপিয়ে

পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। তখন হয়তো এই ঘরের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবু আশ্চর্যকে জেনো। এইখানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিলো।" [অমরতার কথা]

হরপ্রসাদ মিত্র

কবিতা লেখার এই রীতিটি আধুনিক কবিদের খুব মনোমত। অপরদিকে জীবনে মানুষের ভূমিকা বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে কবিতা লিখেছেন হরপ্রসাদ মিত্র—

"ফাটিকের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধি,
একান্তিক মার্জন এবং বিশুদ্ধি—
সমস্তই ক্ষয় হলো।
আগামী কালের কানে কানে বলো—
মানুষের রক্তে
পান্নার মতো সবুজ ঘাস
চুনির মতো লাল হলো।" [চুনি পান্নার কান্না]

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

প্রতীকীবাদী সঞ্জয় ভট্টাচার্যও কোন কোন কবিতায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। লিরিকের কারুশিল্পে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়—

হৃদয়ের অনুভবগুলো
একদিন স্মৃতি হয়ে যায় :
আকাশে ঘনিক আর ঘনিক হাওয়ায়,
কোনো এক পথের কিনারে,
হঠাৎ বিকেলে জানালায়
ছবির মতন যেন কিছু আঁকা থাকে;
ছবি আছে—রেখা নয়,
ঘোলাটে স্বরের রঙে রেখাগুলো মুছে গেছে বলে মনে হয়।" [অনুভব]

কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্য বন্ধ হলো না, বিশেষত নীরেন্দ্রনাথ, মণীন্দ্র রায় ও সুশীল রায়, যদিও চল্লিশের দশকে তাঁরা নবাগত মাত্র, নতুন দিগবলয়ের সন্ধানে যাত্রা শুরু করলেন। বড়ো একক প্রতিভার দেখা না পাওয়া গেলেও, কবির সংখ্যা-বৃদ্ধি হলো, সামাবাদের প্রভাব রইলো অব্যাহত।

কথাশেষ

আমাদের আলোচ্য কালসীমা আধুনিক কাব্য আন্দোলনের পরবর্তী পঁচিশ বছর, সেই পঁচিশ বছরে বাংলা কবিতার যে বিস্ময়কর অগ্রগতি দ্বান্দ্বিক যন্ত্রণার রক্তাক্ত পথ পার হয়ে নিশ্চিন্ত পথে পৌঁছবার সাধনা করেছে তা যেমন অভিনব তেমনি চমকপ্রদ। এই পর্বের শেষ ভাগটি যে প্রথমাংশের মতো ঔজ্জ্বল্য নিয়ে উপস্থিত হয়নি, সে কথাও সত্য তবু পরবর্তীকালের কবিতাকে নতুন খাতে নিয়ে যাবার জন্য মধ্যবর্তী পর্যায়ের এই স্তব্ধতা বা নিস্তব্ধ প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কবিতার জগতে এ সময়ে আলোড়ন না থাকলেও ভারতবাসীর জীবনে প্রাক্-স্বাধীনতার শেষ দশ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমাগত ভাঙাগড়া

ও অবক্ষয়িত মূল্যবোধের বিলীয়মান অনুভূতি ও সময় সকলকেই বিভ্রান্ত করেছিলো, জীবন এবং অভিজ্ঞতা যে কোন্ দিকে পুনরায় মোড় ফিরবে সেই অস্থির-চিন্তা সবাইকে জর্জর করেছিল। সারা বিশ্বের সমস্যার সঙ্গে ভারতের নিজস্ব সমস্যা মিশে এই সময়টাই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। হিটলারের অভ্যুদয় ও ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভে এর কেন্দ্রবিন্দু। এই যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও মারাত্মক এবং আতঙ্ক-জনক। এবার ভারতবর্ষ পর্যন্ত যুদ্ধের মরণ ফাঁসে জড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম যুদ্ধের শুরুতে যে নতুন আশা ছিল, এবার তার পরিবর্তে দেখা গেল প্রবল হতাশা। সাম্রাজ্যবাদের ক্রমলোলুপতা পশ্চিমী পুঁজিবাদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা সঞ্চার করলো। চরিত্রচ্যুত সমাজ-ব্যবস্থার অবমানবিক উন্মাদনা সমস্ত বিশ্বাসকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে বিভীষিকার লোলুপ-স্পর্শ আপামর ভারতবাসীকে শুধু চমকিত নয় বিমূঢ় করে দিলে, সারা জীবনের বিশ্বাস ও শান্ততা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন 'সভ্যতার সংকটে', ফুটে উঠল মর্মান্তিক বেদনার অশ্রুসিক্ত বাণী :

"জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তর সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"

অস্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সেইসঙ্গে বলতে পেরেছিলেন :

"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ"।

কিন্তু যে যুদ্ধ তাঁর মতো মহামানবের বিশ্বাস হরণ করলো তার প্রতি, কিংবা সেই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা সাধারণের আর রইলো না। বাঙালি জীবনে দ্বিতীয় ঘটনা হলো ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সবার সামনে থেকে বিরাট ব্যক্তিত্বের নিরবয়ব বাধাকে সরিয়ে দিল। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসহীনতাও এ সময়ে বাঙালি কবিদের কিঞ্চিৎ রবীন্দ্রমুখী করেছিল, বিশেষত এলিয়টের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি অনুসন্ধান বাঙালি কবিদের স্বধামে ফিরিয়ে এনেছিল। "নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই"—প্রায় এই ধরনের মনোভাব নিয়ে বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের সচেতন মনীষিতা আবেগ ও ধারণার সমন্বয় ঘটাতে চাইলেন এবং বলা বাহুল্য কৃতকার্য হলেন। জীবনানন্দ লিখলেন :

"রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সাহায্য ও ইঙ্গিত পেয়ে আজ যে আধুনিক কাব্যের ঈষৎ-সূত্রপাত হয়েছে তার পরিণাম বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি ভেঙ্গে ফেলে কোনো সম্পূর্ণ অভিনব জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে, সাহিত্যের ইতিহাস এ রকম অজ্ঞাত-কুলশীল কোন জিনিস নয়। ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে যুগে ঘুরে ফিরে সেক্সপীয়র-এর কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছেন, আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে—।"

কিন্তু বাঙালি কবিদের জীবনে বহিরাঘাত এখানেই শেষ হলো না। ১৯৪২-এ অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৪৩-এ মন্বন্তর, ১৯৪৫-এ জাপানে আণবিক বোমা বর্ষণ, ১৯৪৬-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগ এবং স্বাধীনতা লাভ, ১৯৪৮-এর জানুয়ারীতে মহাত্মা গান্ধীর আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু—এতগুলি ঘটনার অভিঘাত পূর্ববর্তী ধারণার পারম্পর্য নষ্টই করলো না, ক্রমোত্থিত নানাবিধ সমস্যার সান্দ্র জটিলতা, যা কবিদের পায়ের নিচের ভিত আগেই কাঁপিয়ে দিয়েছিল, এবার একমাত্র খোলা আকাশটাকেও অধিকার করলো। পূর্বতন আধুনিক কবিরা, পঁচিশ বছর আগে যারা ছিলেন আন্দোলনের নেতা, তাঁরা আশ্রয় নিলেন রবীন্দ্রমণ্ডলে।

সার্থক উত্তরাধিকারী হিসেবে, আর নবাযুগের অতি আধুনিক কবিরা নৈরাজ্যের কম্পিত-ভূমিতে পা রেখে স্বধর্ম-চর্চা শুরু করলেন, ভাবীকালের ইতিহাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। তাঁদের শৈল্পিকতা নির্দ্বন্দ্ব নয় বলে আশা করা যায়। কবিতায় মায়াবী-প্রতিবেশ ও সৌন্দর্য-সাধনার চাবিকাঠিটি তাঁরাও খুঁজে পেয়েছেন, তবে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা নিয়ে তাঁদের বিচার করার সময় আজো আসেনি।

অনুসৃত ও পঠিতব্য গ্রন্থ :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ, সভ্যতার সংকট।
ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী : আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়।
বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা।
বুদ্ধদেব বসু : কালের পুতুল, সাহিত্য চর্চা, আধুনিক বাংলা কবিতা (সম্পাদিত)।
জীবনানন্দ দাশ : কবিতার কথা।
বিষ্ণু দে : সাহিত্যের ভবিষ্যৎ।
অমিয় চক্রবর্তী : সাম্প্রতিক।
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : স্বগত।
আলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : আধুনিক কবিতার ইতিহাস।
ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু : আধুনিক বাংলা কাব্যের গতিপ্রকৃতি।
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : কবিতা কল্পনালতা।
জীবেন্দ্র সিংহরায় : কল্লোলের কাল।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ।
আবু সৈয়দ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : আধুনিক বাংলা কবিতা।
স্বদেশী ও বিদেশী কবিদের যেসব কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে সেগুলির স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হলো না।
[সৌজন্য : সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৪।]

লেখা যাবে
১. আধুনিকতা : বাংলা কবিতা
২. বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা কবিতা
৩. বিশের দশকের বাংলা কবিতা ও কবিবর্গ
৪. বাংলা কবিতা : তিরিশের দশক
৫. আধুনিক বাংলা কবিতা : সংজ্ঞা-পটভূমি ও পরিচয়
৬. আধুনিক কবিতার পঞ্চপাণ্ডব
৭. তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশের কবিতা
৮. আধুনিক বাংলা কবিতা
৯. কবিতার একাল